একটি গোরুর গাড়ি। মূল ছবিটি ব্যারন দ্য মঁতলেমবার-এর আঁকা (আনুমানিক ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ)। ছবিটি জেমস ফোর্বস-এর **Oriental Memoirs** বইয়ের প্রথম খণ্ডে (১৮১২ খ্রিস্টাব্দ) মুদ্রিত হয়েছিল।

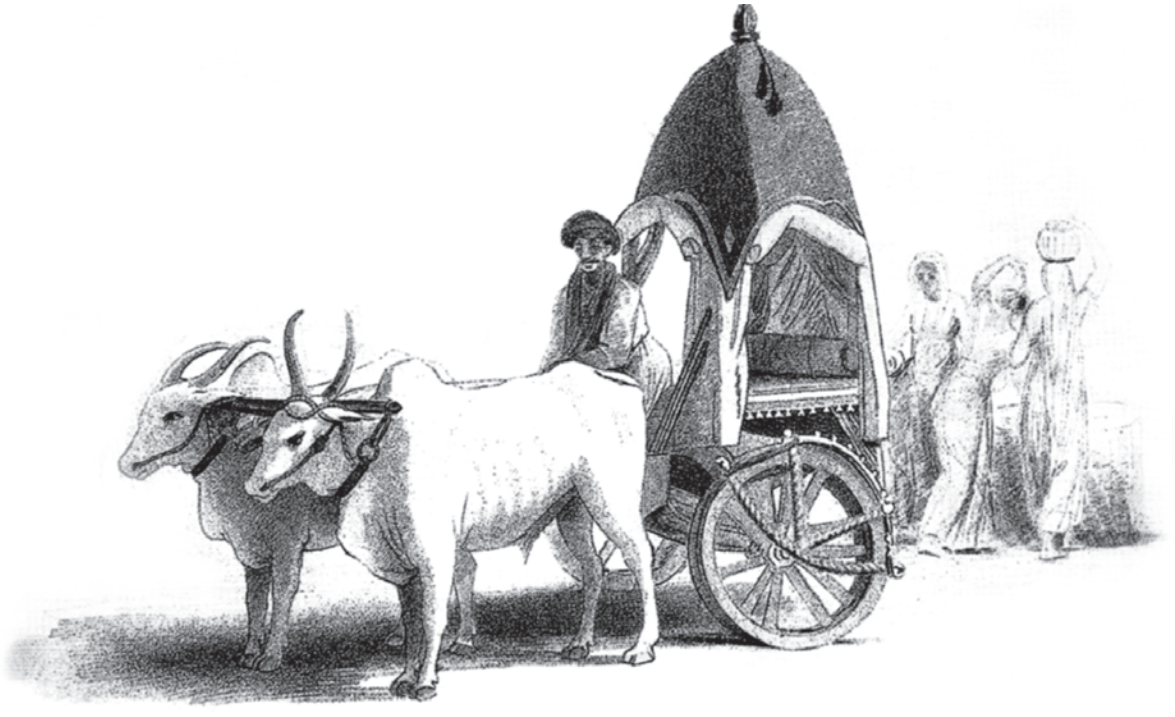

৩ ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আদতে ছিল একটি বণিক সংস্থা। ভারতীয় উপমহাদেশে বাণিজ্যের স্বার্থে তারা কতগুলি ঘাঁটি তৈরি করেছিল। সেই ঘাঁটিগুলির মধ্যে ছিল মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতা। কালক্রমে এই তিনটি বাণিজ্যঘাঁটিকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। ১৬১১

গভর্নমেন্ট হাউস, কলকাতা। মূল ছবিটি জেমস বেইলি ফ্রেজার-এর আঁকা (আনু. ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ)।

ও ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে মসুলিপটনম ও সুরাটকে ঘাঁটি করে ব্রিটিশ কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। পরে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে একটি বাণিজ্যিক ঘাঁটি বানায় কোম্পানি। মাদ্রাজপটনম গ্রামে সেন্ট জর্জ দুর্গও বানায় ব্রিটিশ কোম্পানি। ক্রমে সেন্ট জর্জ ও মাদ্রাজকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় সেন্ট জর্জ দুর্গ প্রেসিডেন্সি বা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অঞ্চলগুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতের বিরাট অংশ পড়েছিল। আজকের তামিলনাড়ু, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলের পাশাপাশি,

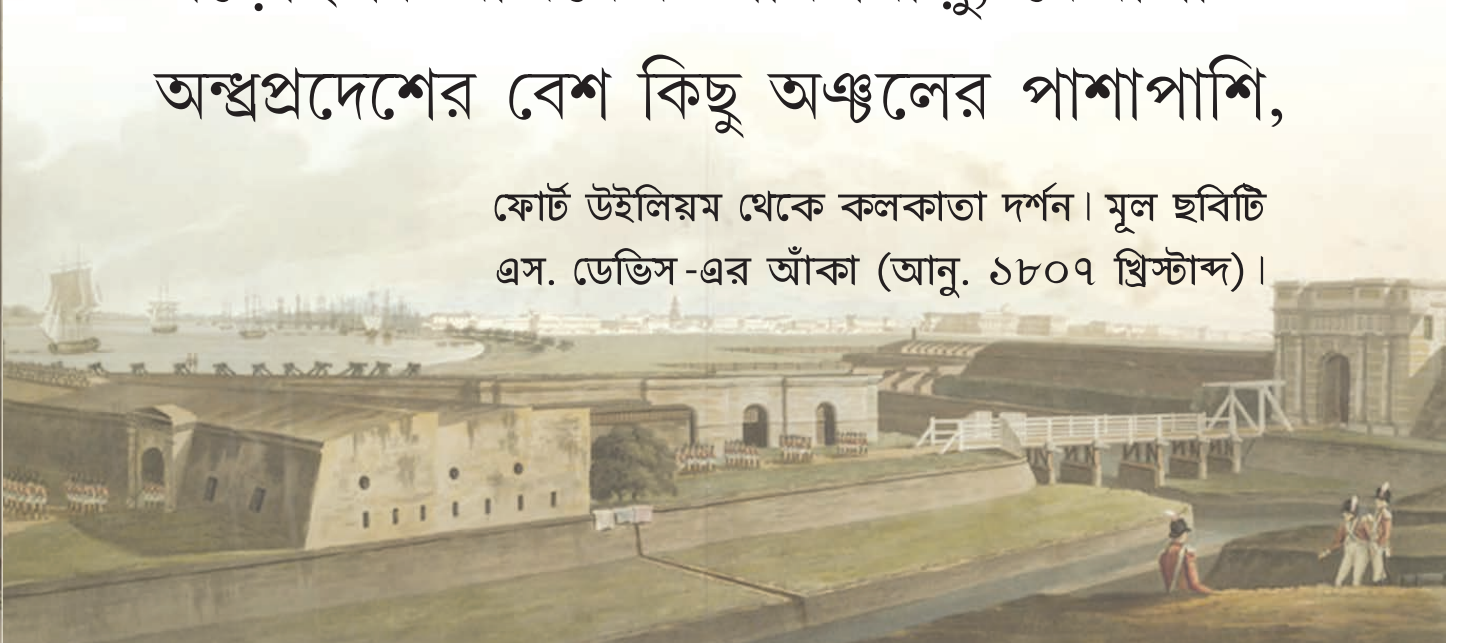

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কলকাতা দর্শন। মূল ছবিটি এস. ডেভিস-এর আঁকা (আনু. ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ)।

কর্ণাটক ও দক্ষিণ উড়িষ্যার বেশ কিছু অঞ্চলও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রেসিডেন্সির দুটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। গ্রীষ্মকালে ওটাকামুন্দ ও শীতকালে মাদ্রাজ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মূল গোড়াপত্তন হয়েছিল সুরাটে ব্রিটিশ কোম্পানির ঘাঁটি বানানোকে কেন্দ্র করে। ধীরে ধীরে পশ্চিম ও মধ্য ভারত এবং আরব সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলি মিলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি তৈরি হয়। সিন্ধু প্রদেশও এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। গোড়ার দিকে এই প্রেসিডেন্সিটি পশ্চিম প্রেসিডেন্সি নামে পরিচিত ছিল। তবে সুরাটের ক্রমে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে অবনতি হতে থাকে। পাশাপাশি বোম্বাই উন্নত হতে

থাকে। ফলে, ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোম্বাইকে ঘিরেই ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির কার্যকলাপ বিস্তৃত হতে থাকে।

কলকাতাকে ঘিরে পূর্বভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ দ্রুততর হয়েছিল। ধীরে ধীরে কলকাতাই হয়ে উঠেছিল ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির অধিকার পায়, তখন থেকেই বাংলার উপর কোম্পানির কর্তৃত্ব গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নিজামতের অধিকার পায় ব্রিটিশ কোম্পানি। এইভাবে দেওয়ানি ও নিজামত— দুই অধিকার পেয়ে বাংলায় ব্রিটিশ

কোম্পানির অধিকার চূড়ান্ত হয়। বাংলাতেও গড়ে ওঠে প্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চল মিলে ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি। ধীরে ধীরে এই প্রেসিডেন্সিতে যুক্ত হয়েছিল আরও বহু অঞ্চল। পঞ্জাব, উত্তর ও মধ্য ভারতের অঞ্চলগুলি এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অঞ্চলও বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। মাদ্রাজের মতো কলকাতাতেও ব্রিটিশ কোম্পানি দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়ম) বানিয়েছিল। তাই বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রেসিডেন্সিও বলা হতো এক সময়ে।

এইভাবে তিনটি প্রেসিডেন্সিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ গড়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতার ঘাঁটিগুলি

তিনটি আলাদা পরিষদ বা Council-এর মাধ্যমে পরিচালিত হতো। লন্ডনে ব্রিটিশ কোম্পানির যে পরিচালকগোষ্ঠী বা Council of Directors ছিল, তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে চলত তিনটি কাউন্সিল। কাউন্সিলের একজন সদস্যকে ঐ ঘাঁটির গভর্নর নির্বাচিত করা হতো।

কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির বণিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের উপর ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার প্রসঙ্গ ওঠে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সে বিষয়ে নানা আইন তৈরি করা হয়। সেই সব আইন মোতাবেক ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কাজ-কারবারের

উইলিয়ম পিট

উপর সরাসরি ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। এই রকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের পিট প্রণীত ভারত শাসন আইন।

টুকরো কথা

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিট প্রণীত ভারত শাসন আইন

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলা প্রেসিডেন্সি তিনটির স্বতন্ত্র কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। গভর্নর জেনারেল বলে নতুন একটি পদ তৈরি করা হয়। ঠিক করা হয় বাংলার গভর্নরই হবেন গভর্নর জেনারেল।

তাঁর অধীনেই মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাণিজ্যিক ঘাঁটিগুলির গভর্নরেরা থাকবেন। গভর্নর জেনারেল পদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। চারজন সদস্য নিয়ে তৈরি হবে একটি গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল। বস্তুত, এই আইনের ফলে কলকাতা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রাজধানীতে পরিণত হয়।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট (যাঁকে William Pitt, the younger বলা হতো) নতুন একটি আইন বানান। সেই আইনকে পিট প্রণীত বা পিটের ভারত শাসন আইন বলা হয়। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ঐ আইনটি বলবৎ হয়। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানির কার্যকলাপের উপর

ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নজরদারি নিশ্চিত হয়েছিল।

পিট প্রণীত আইন মোতাবেক একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোল তৈরি করা হয়। সেই বোর্ডকে কোম্পানির সামরিক ও অসামরিক শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ঐ আইনে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে, ভারতে কোম্পানির সমস্ত প্রশাসনিক কর্তাই গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব মেনে চলতে বাধ্য।

ফোর্ট উইলিয়ম থেকে কলকাতা দর্শন। মূল ছবিটি এস. ডেভিস -এর আঁকা (আনু. ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ)।

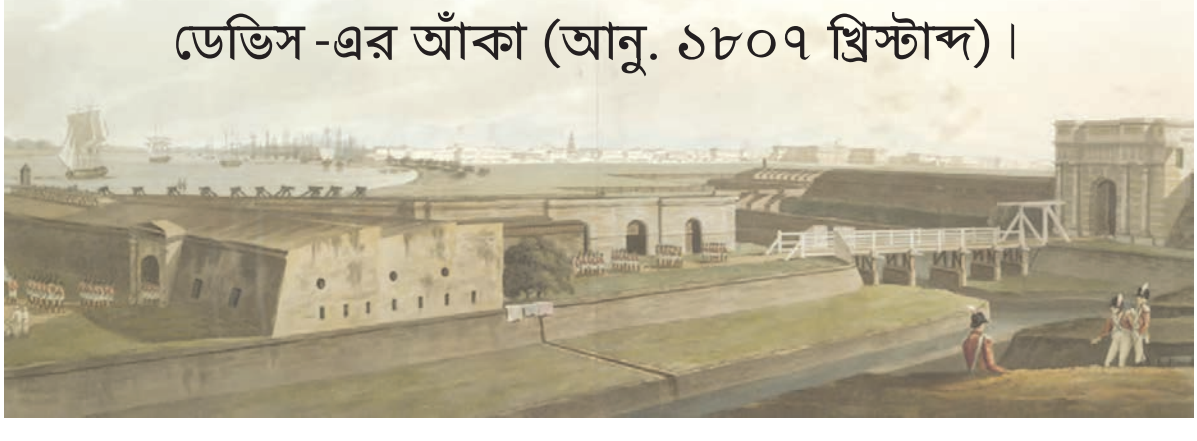

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলেও গোড়ায় মুঘল ব্যবস্থাই ছিল দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের মাপকাঠি। তবে কোম্পানির অনেক কর্মচারী ঐ ব্যবস্থার মধ্যে নানা রকম গরমিলের অভিযোগ তুলত।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দ্বৈত শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে। সেই সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের কাজ শুরু করেন। কোম্পানির শাসনকে একটি স্থায়ী ও নিশ্চিত সংগঠিত রূপ দেওয়ার পিছনে হেস্টিংসের ও পরে লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই দেশীয় অভিজাতদের হাত থেকে বিচার ব্যবস্থাকে আলাদা করার প্রস্তাব ওঠে। পাশাপাশি ইউরোপীয়দের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে যে সুষ্ঠু বিচার সম্ভব তা নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে। ফলে বিচার ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কোম্পানির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ শুরু হয়। মনে করা হতো এর মাধ্যমে সাধারণ ভারতীয়রা ক্রমেই কোম্পানি- শাসনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে নতুন বিচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রতি জেলাতে একটি দেওয়ানি ও একটি ফৌজদারি

আদালত তৈরি করা হয়। তবে আইন-কানুনে মুঘল প্রভাব তখনও রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ানি আদালত গুলিতে প্রধান ছিলেন ইউরোপীয়রাই। পাশাপাশি দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করার কাজ করতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মুসলিম মৌলবীরা। ফৌজদারি আদালতগুলিতে একজন করে কাজি ও মুফতি থাকতেন। যদিও সেগুলির দেখভালের চূড়ান্ত দায়িত্ব ইউরোপীয়দের হাতেই ছিল।

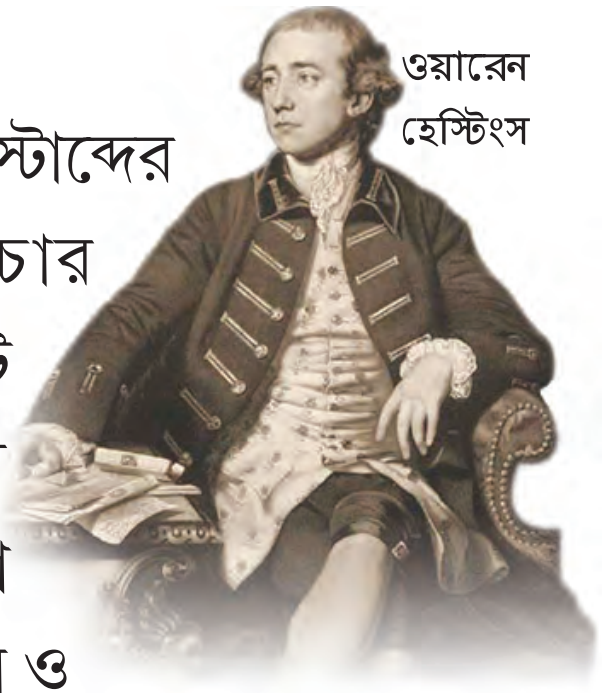
ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭৭৩ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। তার পিছনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস ও

সুপ্রিম- কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এলিজা ইম্পে। ঐসব সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত ইউরোপীয়করণ করা হয়েছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বলা হয়েছিল বিচার বিভাগের সমস্ত আদেশ লিখে রাখতে হবে। সমস্ত দেওয়ানি আদালতগুলিকে একই নিয়মের অধীনে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

টুকরো কথা

সুপ্রিম কোর্ট

রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩ খ্রি:) অনুযায়ী ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় একটি ইম্পিরিয়াল কোর্ট তৈরি করা হয়। সেখানে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল যে, কেবল ভারতে থাকা ব্রিটিশ নাগরিকদেরই বিচার করবে এই

এলিজা ইম্পে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি।

কোর্ট। কিন্তু, ক্রমশই সেই কোর্টের নানান কার্যকলাপকে ঘিরে ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে কোর্টের বিরোধিতা তৈরি হয়। কোর্ট প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতো। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আইন করে ইম্পিরিয়াল তথা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বলা হয় যে, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কোনোও মামলা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারে পড়বে না। তাছাড়া কোম্পানির গভর্নর ও গভর্নরের কাউন্সিলের কাজকর্মে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক সংখ্যা চারের বদলে তিনজন করা হয়। ১৮০১ ও ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও একটি করে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে, গোটা ভারত জুড়ে তিনটি সুপ্রিম কোর্ট তৈরি হয়েছিল।

বিচারে সমতা আনার জন্য দরকার ছিল প্রচলিত আইনগুলির অভিন্ন ব্যাখ্যা। সেই উদ্যেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে ১১ জন পণ্ডিত হিন্দু আইনগুলির একটি সারসংকলন তৈরি করেন। ঐ সংকলনটির ইংরেজী অনুবাদ করা হয়। তার ফলে দেশীয় আইনের ব্যাখ্যার জন্য ইউরোপীয় বিচারকদের ভারতীয় সহকারীদের উপরে

বিশেষ নির্ভর করতে হতো না। মুসলমান আইনগুলিরও একটি সংকলন বানানো হয়। এসবের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস আইনগুলিকে সংহত করে কোড বা বিধিবদ্ধ আইন চালু করেন। তার ফলে দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব আলাদা করা হয়। জেলা থেকে সদর পর্যন্ত আদালত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। নিম্ন আদালতের

লর্ড কর্নওয়ালিস

রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদনের অধিকার স্বীকার করা হয়। তবে সমস্ত আদালতেই প্রধান বিচারপতি হতেন ইউরোপীয়রাই। লর্ড কর্নওয়ালিসের বিচার ব্যবস্থার সংস্কার বাস্তবে ঔপনিবেশিক বিচার কাঠামো থেকে ভারতীয়দের পুরোপুরি বাদ দিয়েছিল।

মুঘল আমলে বিচার ব্যবস্থা থেকে ব্রিটিশ আমলের বিচার ব্যবস্থার বদলগুলি সাধারণ ভারতীয়রা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। বিচার কাঠামোকে সংহত করার মাধ্যমে সেগুলি হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

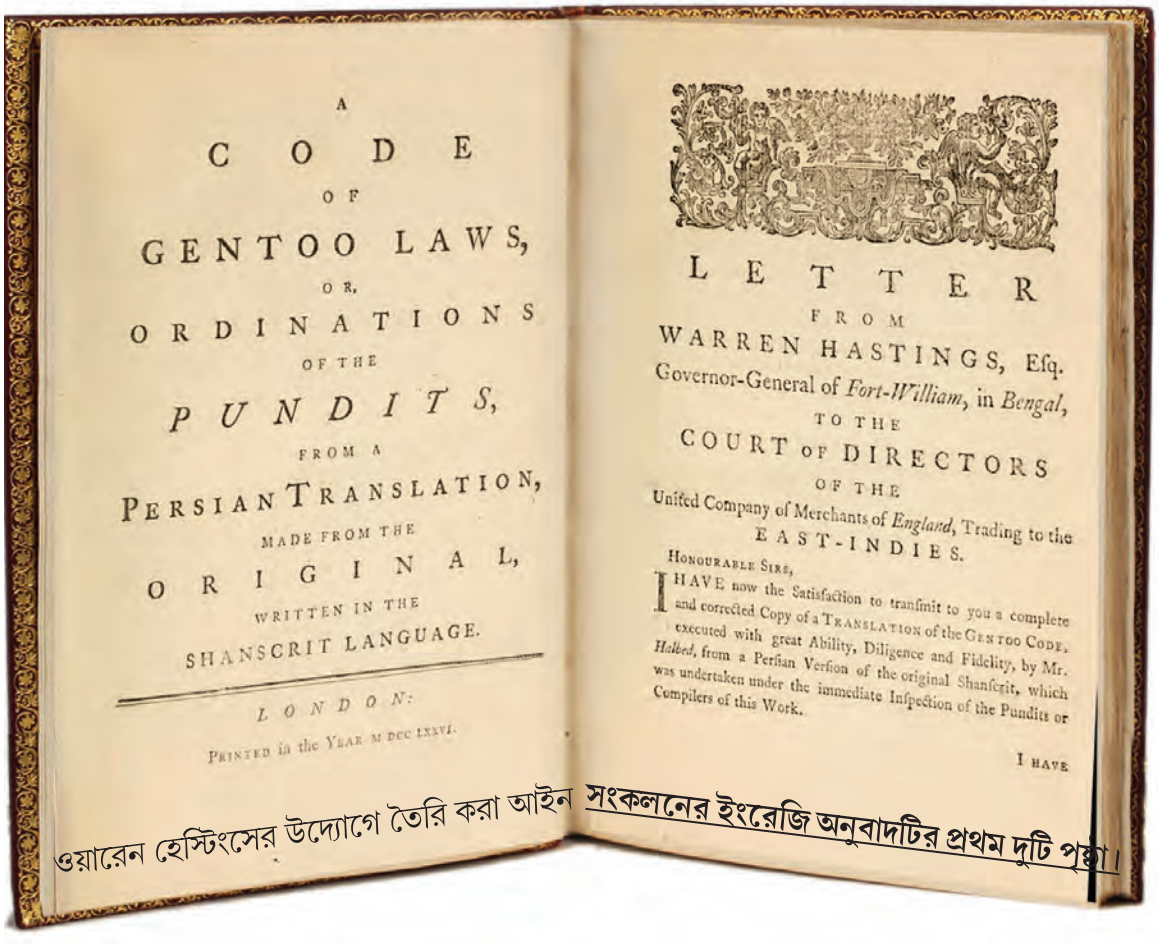

A
CODE
OF
GENTOO LAWS,
OR,
ORDINATIONS
OF THE
PUNDITS,
FROM A
PERSIAN TRANSLATION,
MADE FROM THE
ORIGINAL,
WRITTEN IN THE
SHANSCRIT LANGUAGE.

LONDON:
PRINTED in the YEAR M DCC LXXVI.

LETTER
FROM
WARREN HASTINGS, Esq.
Governor-General of *Fort-William*, in *Bengal*,
TO THE
COURT OF DIRECTORS
OF THE
United Company of Merchants of *England*, Trading to the
EAST-INDIES.

HONOURABLE SIRS,

I HAVE now the Satisfaction to tranſmit to you a complete and corrected Copy of a TRANSLATION of the GENTOO CODE, executed with great Ability, Diligence and Fidelity, by Mr. *Halhed*, from a Perſian Verſion of the original Shanſcrit, which was undertaken under the immediate Inſpection of the Pundits or Compilers of this Work.

I HAVE

ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে তৈরি করা আইন সংকলনের ইংরেজি অনুবাদটির প্রথম দুটি পৃষ্ঠা।

টুকরো কথা

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সংস্কার

গভর্নর জেনারেল হিসাবে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক চেয়েছিলেন প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে। পাশাপাশি ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়টিকেও

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক

বেন্টিঙ্ক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ ও বারাণসী অঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর সময়েই উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঐসব অঞ্চলে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন বেন্টিঙ্ক।

বেন্টিঙ্কের সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতি পদে আবার ভারতীয়দের নিয়োগ করা শুরু হয়। বেন্টিঙ্কের আমলে তৈরি হওয়া আইনে বলা হয়, কোম্পানি কর্মচারী নিয়োগের

ঠগিদের একটি দল। ছবিটিতে ঠগিরা কীভাবে পথিকের সর্বস্ব লুঠ করে তাকে হত্যা করত, তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মাপকাঠির বদলে কেবল যোগ্যতা বিচার করবে। উঁচুপদে নিয়োগ করলেও ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন কম দেওয়া হতো। উত্তর ও মধ্য ভারতে সক্রিয় ঠগি দস্যুদের দমন করার জন্যেও কর্নেল স্লিম্যানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ বিভাগ তৈরি করেন বেন্টিঙ্ক। দ্রুতই স্লিম্যান ঠগি দস্যুদের দমন করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন প্রকরণ

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিট প্রণীত আইনের ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের উপর ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হয়েছিল। ফলে, ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ ব্রিটিশ-স্বার্থে পরিচালিত করার উদ্যোগ

জোরদার হয়। পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন যত বাড়ল ততই তাকে চালানোর জন্য সম্পদের দরকার হলো। ফলে শাসন চালানোর ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হলো দক্ষ শাসন যন্ত্রের। গোটা দেশে কোম্পানি-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে একইরকম শাসন চালু করা হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি ভারতীয় শাসকের মতো করে শাসন চালাতো। ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। সুষ্ঠু শাসনের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রকে ঢেলে সাজানো দরকার হয়ে পড়েছিল। বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি পুলিশ ও সেনা ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র বাস্তবগ্রাহ্য রূপ পেয়েছিল।

পুলিশ ব্যবস্থা

মুঘল পুলিশ ব্যবস্থায় ফৌজদার, কোতওয়াল, চৌকিদারদের ক্ষমতা ছিল বেশি। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানি লাভ করে তখনও এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মন্বন্তরের ফলে সামাজিক 'আইন শৃঙ্খলার অবনতি' দেখা দেয়। সেই ক্ষেত্রে মুঘল আমলে পুলিশি ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী ছিল না। তাই পুলিশ ব্যবস্থাকেও ইউরোপীয় তদারকির অধীনে ঢেলে সাজানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। কারণ ক্রমশ বাড়তে থাকা 'আইন শৃঙ্খলার অবনতি' ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে সহায়ক ছিল না। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুরোনো ফৌজদারি ব্যবস্থা

চললেও শেষ পর্যন্ত ফৌজদারদের জায়গায় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের বসানো হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস জেলাগুলির দেখভাল করার জন্য পুলিশ থানা ব্যবস্থা চালু করেন। প্রতিটি থানার দায়িত্ব পায় দারোগা। তাদের নিয়ন্ত্রণ করত ম্যাজিস্ট্রেটরা। স্থানীয় অঞ্চলে

বাংলা প্রেসিডেন্সির পুলিশ বাহিনী। মূল ছবিটি ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ-এ ছাপা (১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ)।

সাধারণ মানুষের কাছে দারোগারাই ছিল কোম্পানি-শাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক। কিন্তু স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে দারোগারা সমঝোতা করে চলত। ফলে সাধারণ মানুষের উপর চলত জমিদার ও দারোগার যৌথ পীড়ন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকিভাবে দারোগা ব্যবস্থার বিলোপ করা হয়। তার বদলে গ্রামের দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয় কালেক্টরকে। ফলে আবারও রাজস্ব আদায় ও আরক্ষার দায়িত্ব একজনের হাতেই চলে যায়। রাজস্ব আদায় ও পুলিশি দমন পীড়ন চালাতে থাকে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরাই। কিন্তু এরকম আপাত সংস্কারের মধ্যে দিয়ে পুলিশি

ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে তোলা যায়নি।

ব্রিটিশ কোম্পানির মূল লক্ষ্য ছিল পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করা। সেই উদ্দেশ্যে পুলিশ ব্যবস্থার নানারকম সংস্কার করা হতে থাকে। শেষপর্যন্ত ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশ অঞ্চলে নতুন ধাঁচের পুলিশি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। ক্রমে আলাদা পুলিশ আইন বানানো হয়। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রদর্শনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল পুলিশি ব্যবস্থা।

সেনাবাহিনী

প্রাথমিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের যেকোনো বিরোধিতার মোকাবিলা করত পুলিশ বাহিনী। তবে পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে উঠলে প্রয়োজন পড়ত সেনাবাহিনীর। ফলে ভারতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে বেড়ে উঠেছিল কোম্পানির সেনাবাহিনী। গোড়া থেকেই স্থায়ী সেনাবাহিনী তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল কোম্পানি। সেক্ষেত্রে মুঘল সেনা নিয়োগের পরম্পরা অনুসরণ করেছিল ব্রিটিশরা। উত্তর ভারতে কৃষকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। এমনকি সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে রাখা হতো। সেই প্রথা মেনেই কোম্পানিও নিজের ভারতীয় সেনা বা

সিপাহিবাহিনী তৈরি করেছিল।

সেনাবাহিনীতে সিপাহি নিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে সামরিক খাতে ঔপনিবেশিক শাসক সবথেকে বেশি খরচ করত। কোম্পানির হয়ে এলাকা দখল করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্রোহের মোকাবিলা করাও সিপাহিদের কাজ ছিল।

বাংলা প্রেসিডেন্সির সেনাবাহিনী। আনুমানিক ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তোলা ফটোগ্রাফ।

ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে সেনাবাহিনীতে প্রচলিত জাতভিত্তিক ধারণাগুলির বিরোধিতা করেনি ব্রিটিশ কোম্পানি। ফলে সিপাহিবাহিনীতে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত কৃষকরা সহজেই জায়গা করে নিত। এইসব লোকেরা সিপাহিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ও নিয়মিত বেতন পেত। ফলে সিপাহি বাহিনীতে জাতভিত্তিক মনোভাব দেখা যেতে থাকে।

১৮২০-র দশক থেকে সিপাহি বাহিনীর কাঠামোয় বেশ কিছু বদল দেখা দিতে থাকে। মারাঠা, মহীশূর অঞ্চলের পাহাড়ি উপজাতি ও নেপালি গুর্খাদের সিপাহি বাহিনীতে নিয়োগ করা শুরু হয়। ফলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ও রাজপুত কৃষকদের

সুযোগ-সুবিধা কমতে থাকে। তার জন্য সিপাহিবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হতে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে সিপাহিবাহিনী ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফলে ১৮৮০-র দশকে ব্রিটিশ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে প্রায় ২,৫০,০০০ সিপাহি ছিল। যাদের পিছনে মোট রাজস্বের ৪০ শতাংশ ব্যয় করা হতো।

টুকরো কথা

সামরিক জাতি

ব্রিটিশ শাসকের ধারণা ছিল যেসব ভারতীয় ভাত খায় তারা শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। রুটি খাওয়া ভারতীয়রা নাকি শারীরিকভাবে বেশি সক্ষম। ফলে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের

ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাসের তারতম্যের বিচার করা হতো। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের পর সিপাহি বাহিনীকে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। তখন থেকেই পঞ্জাবের জাঠ অধিবাসীদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি পাঠান, উত্তর ভারতের রাজপুত ও নেপালি গুর্খাদের সংখ্যাও সেনাবাহিনীতে বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা বলত এই সব সেনারা যুদ্ধে অনেক বেশি দক্ষ। এদেরকে 'সামরিক জাতি' বলে প্রচার করা হতো। এর বদলে এই সিপাহিরা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থাকত। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঔপনিবেশিক সেনার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই ছিল তথাকথিত সামরিক জাতির লোক।

আমলাতন্ত্র

অসামরিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকের প্রধান হাতিয়ার ছিল আমলাতন্ত্র। তবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমলাদের স্বাধীনতা ছিল না। ইংরেজ সরকারের গৃহীত নীতিগুলি প্রয়োগ করাই ছিল আমলাদের কাজ। ফলে একটি সংগঠিত আমলাতন্ত্র ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল।

কোম্পানি-প্রশাসনের অধীনে আমলাতন্ত্রকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস সিভিল সার্ভিস বা অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেন। ভারতের ব্রিটিশ প্রাশাসনকে

দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল কর্নওয়ালিসের। তাঁর ধারণা ছিল, উপযুক্ত বেতন না পাওয়ার ফলেই কোম্পানির কর্মচারীরা সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে না। ফলে কর্নওয়ালিস আইন জারি করে কোম্পানি -প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও কোনো রকম উপহার নেওয়া বন্ধ করে দেন। তার পাশাপাশি চাকরির মেয়াদের ভিত্তিতে সিভিল সার্ভেন্টদের পদোন্নতির ব্যবস্থা চালু করেন কর্নওয়ালিস। অবশ্যই প্রশাসনের কর্মচারীদের বেতনও বাড়িয়ে দেন তিনি।

লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকেই সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ করা বন্ধ হয়। লর্ড

ওয়েলেসলি ইউরোপীয় প্রশাসকদের ভালোমত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেজন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিভিল সার্ভেন্ট বা অসামরিক প্রশাসকেরা ঐ কলেজে শিক্ষা পেতেন। তবে ব্রিটেনে কোম্পানির পরিচালকরা কলকাতায় প্রশিক্ষণের বদলে ব্রিটেনে প্রশিক্ষণকেই উপযুক্ত বলে মনে করতেন। শেষ পর্যন্ত হেইলবেরি কলেজে প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটি শুরু করা হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সমস্ত প্রার্থীদেরকেই হেইলবেরি কলেজে যোগ দিতে হতো। একই কলেজে পড়ার ফলে সিভিল

সার্ভেন্টদের মধ্যে একটি ঐক্যবোধ তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি সিভিল সার্ভেন্টরা নিজেদের একটি আলাদা গোষ্ঠী হিসাবে ভাবতে শুরু করে। ঐ ঐক্যবোধ ও সংকীর্ণ গোষ্ঠী ভাবনা অবশ্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা। মূল ছবিটির শিরোনাম Our Judge। ছবিটি জর্জ ফ্রাঙ্কলিন অ্যাটকিনসন-এর আঁকা।

টুকরো কথা

আইনের শাসন ও আইনের চোখে সমতা

ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতে আইনের শাসন-এর ধারণা চালু করেছিল। সেই ধারণা অনুযায়ী বলা হতো আদর্শগতভাবে ঔপনিবেশিক প্রশাসন আইন মেনে কাজ করবে। আইনে শাসক ও শাসিতের সমস্ত অধিকারগুলি স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা থাকবে। শাসকের খামখেয়ালি ইচ্ছার উপরে শাসনপ্রণালী নির্ভর করবে না। এককথায় আইনের শাসন-এর ধারণায় খানিকটা গণতান্ত্রিক প্রশাসনের কথা বলা হয়েছিল।

কার্যত অবশ্য আদালতের দেওয়া আইনের ব্যাখ্যা মোতাবেক ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাজ করত।

সেই ব্যাখ্যাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই শাসকের স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতো। ফলে আইনের শাসনের আদর্শের মধ্যে নিহিত গণতান্ত্রিক প্রশাসনও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আইনের শাসনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আইনের চোখে সমতার ধারণা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে একই আইন চালু করার কথা বলা হয়েছিল। অবশ্য সেক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমও ছিল। ইউরোপীয় ব্যক্তিদের বিচারের জন্য আলাদা আইন ও আদালত ছিল। তাছাড়া বাস্তবে আইন-আদালতকেন্দ্রিক বিচার ব্যবস্থা ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

মুদ্রিত বাংলা বই

ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠ- পোষণায় একটি হিন্দু আইন সংকলন করা হয়। সেটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন নাথানিয়েল ব্র্যাসি হালেদ। ইংরেজি অনুবাদটির সংক্ষিপ্ত নাম A Code of Gentoo Law। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হালেদ একটি বাংলা ব্যাকরণও লিখেছিলেন। তার নাম A Grammar of the Bengal Language। ব্যাকরণ বইটি হুগলির জন অ্যান্ড্রুজ-এর ছাপাখানায় ছাপা হয়। ঐ বই ছাপার ক্ষেত্রেই প্রথম বিচল বাংলা হরফ

ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে, বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই জোনাথন ডানকান-এর অনুবাদ করা একটি আইনের বই। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঐ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেটির নাম মপসল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলা হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম।

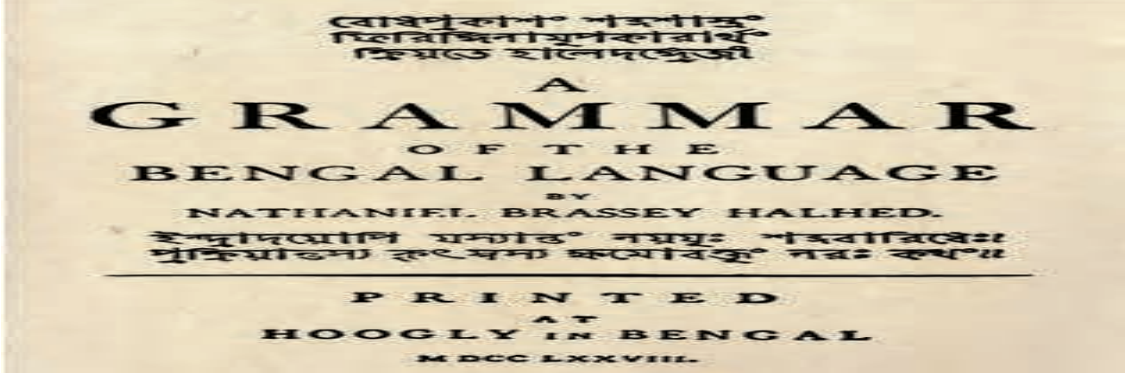

A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.

PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

নতুন শিক্ষা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থরক্ষার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ফারসি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা জানা লোকেদের তিনি রাজস্ব দফতরের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের সুবিধার জন্য হিন্দু ও মুসলিম আইনগুলিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করানোর উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন হেস্টিংস। অন্য দিকে কোম্পানির বিভিন্ন নিয়মনীতিগুলিকেও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করানো হয়েছিল। যেমন, এলিজা ইম্পে যে আইনগুলি বানিয়েছিলেন সেগুলির ফারসি ও বাংলা অনুবাদ করানো হয়। জোনাথন ডানকান ঐ আইনগুলির বাংলা অনুবাদ করেন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। বাস্তবে

হেস্টিংস জানতেন ঔপনিবেশিক সমাজের জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাভাবনার সঙ্গে সম্যক পরিচয় প্রশাসনের কাজে লাগে।

ওয়ারেন হেস্টিংস বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃত পণ্ডিতদের কলকাতায় বিদ্যাচর্চার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। জোনাথন ডানকান ছাড়াও, চার্লস উইলকিনস ও নাথানিয়েল ব্র্যাসি হালেদ হেস্টিংসের উদ্যোগে সামিল হয়েছিলেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে জোনাথন ডানকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিন্দু কলেজ। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ঐ কলেজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঔপনিবেশিক শাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে সুগঠিত করার কাজে সহায়তা করবেন। বস্তুত, তার দশ বছর আগে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে খানিকটা একই উদ্দেশ্য নিয়ে ওয়ারেন

হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে আরবি ও ফারসি ভাষাচর্চার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

উইলিয়ম জোনস ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূলত সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলি আধুনিক ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করাই ছিল জোনসের লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন এই চর্চার ফলে ভারতের শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে ব্রিটিশদের বোঝাপড়া অনেক সুষম হবে। সেই সুষম বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন আরও সুগম হয়ে উঠবে বলে জোনস মনে করতেন।

উইলিয়ম জোনস

এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন সদস্য এবং শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়ম কেরি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াতেন। তার পাশাপাশি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন স্থানীয় পণ্ডিতদেরও ঐ কলেজে নিয়োগ করা হয়।

উইলিয়ম কেরি

টুকরো কথা

উইলিয়ম কেরি ও ব্যাপটিস্ট মিশন

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাশাপাশি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপন করা হয়েছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ব্রিটিশ কোম্পানির তরফে শিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন উদ্যোগে সামিল হন। নিজেদের মুদ্রণযন্ত্র বসিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষায় বিভিন্ন লেখা ছাপাতে শুরু করেন।

শ্রীরামপুরের মিশনারিদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উইলিয়ম কেরি। তিনি ভারতীয় মহাকাব্যগুলি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া বাইবেলের একটি অংশকে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন কেরি। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হালেদের লেখা বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক বইটিকেও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন কেরি।

ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানা, কলকাতা।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে স্কটিশ মিশনারি সোসাইটির সদস্য আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতায় এসে অনেকগুলি মিশনারি স্কুল তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইন্সটিটিউশন (১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ)। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হেম্যান হোরাস উইলসন-এর নেতৃত্বে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পঠনপাঠন শুরু হয়। ঐ কলেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চার পাশাপাশি পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রশাসন জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন তৈরি করেন। ঐ কমিটি ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কয়েকটি প্রস্তাব দেয়। সেই প্রস্তাবে আরও

দুটি সংস্কৃত কলেজ ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ তৈরি করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এবং ডেভিড হেয়ার ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাশাপাশি কলকাতা শহরের শিক্ষিত ও ধনী বেশ কিছু ব্যক্তিবর্গও হিন্দু কলেজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও হিন্দু কলেজের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে রামমোহন সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন।

নিজে করো

তুমি যে স্কুলে পড়ো, সেই স্কুল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খুঁজে দেখো। সে বিষয়ে একটি চার্ট বানাও তোমার স্কুলের ছবিসহ।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইংরেজি ভাষা-নির্ভর পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটতে থাকে। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রতিবেদনে সরাসরি বলা হয় যে, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারে প্রশাসন বেশি জোর দেবে। তবে তার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও বছরে সরকারি অনুদান বরাদ্দ করা হবে। ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশীয় ভাষাতেও পড়াশোনা করার অধিকার শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। তবে, ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাজ্ঞানকে আবশ্যক বলে ঘোষণা করা হয়। ইংরেজি ভাষা-কেন্দ্রিক শিক্ষাচর্চা-নীতির পিছনে লর্ড মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

টুকরো কথা

মেকলের প্রতিবেদন

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি জেনারেল কমিটি অভ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসঙ্গে একটি প্রতিবেদন বা মিনিটস পেশ করেন। সেই প্রতিবেদনে মেকলে বলেন, ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করাই ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা জন্মগত ভাবে ভারতীয় হলেও; রুচি, আদর্শ ও নৈতিক আচরণের দিক থেকে হবে ব্রিটিশ— এমনটাই আশা করেছিলেন মেকলে। তাঁর প্রতিবেদনে

মেকলে জানিয়েছিলেন, যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার চর্চা করবে তারা কোনও সরকারি অনুদান পাবে না। মেকলেও সংস্কৃত কলেজের বিলুপ্তির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বাস্তবে মেকলের ধারণা ছিল, ব্রিটিশরাই জাতিগতভাবে উন্নত এবং তাদের হাত ধরেই উপনিবেশ হিসেবে ভারতে আধুনিকতা আসবে। সে কারণেই তাঁর প্রতিবেদনে মেকলে ভারতের প্রচলিত জ্ঞানচর্চাকে হেয় করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের চারের ও পাঁচের দশকে ক্রমেই সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তার হতে থাকে। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কাউন্সিল অভ এডুকেশন তৈরি হয়। ক্রমেই কাউন্সিল-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ও তার ছাত্র সংখ্যা বেড়ে চলে। পাশাপাশি

শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ বেড়েছিল। তবে, সেই ব্যয়বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না।

টুকরো কথা

উডের প্রতিবেদন

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বোর্ড অভ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উডের নেতৃত্বে শিক্ষাসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। তাকে উডের প্রতিবেদন বা উড'স ডেসপ্যাচ বলাহয়। সেই ডেসপ্যাচে সরকারকে প্রাথমিক থেকে বিদ্যালয়স্তর পর্যন্ত একটি সুগঠিত শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ও ভারতীয়— দু-ধরনের ভাষা

চর্চার কথা বলা হয়েছিল। সেই মোতাবেক ঔপনিবেশিক সরকারের তরফে কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনটি প্রেসিডেন্সিতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছিল। উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যাও আগের থেকে বাড়ানো হয়। তা ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গোড়া থেকেই অবশ্য ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় জোর পড়েছিল। সেখানের ব্রিটিশ প্রশাসকেরা মনে করতেন কেবল বোম্বাই শহরের মধ্যেই ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনার দাবি তৈরি হয়েছে। ফলে, বোম্বাই শহরের বাইরে অন্যান্য জায়গায় দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষাচর্চা হওয়া উচিত। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোম্বাই

প্রেসিডেন্সিতে অনেক স্কুলেই মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার ব্যবস্থা ছিল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল।

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে গৃহীত শিক্ষাবিস্তার নীতির কতগুলি জরুরি দিক ছিল। ওই শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যই ছিল সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সংযুক্ত করে নেওয়া। বাস্তবে সার্বিক গণশিক্ষার কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। তা ছাড়া উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে শিক্ষাবিস্তারের গণমুখী চরিত্র তৈরি হয়নি। পাশাপাশি উপযুক্ত প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ বা হাতেকলমে শেখার ব্যবস্থা যথেষ্ট না থাকায়

কেবল পুঁথিগত চর্চার উপরেই শিক্ষার বিস্তার নির্ভর করেছিল। তা ছাড়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই নির্বিচার সমর্থনের ফলে ভারতীয় প্রচলিত শিক্ষার চর্চা ক্রমে অবলুপ্তির মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথমদিকে নারীশিক্ষার বিষয়টিকেও অবহেলা করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতিতে। ব্যক্তিগত কয়েকজনের উদ্যোগে নারীশিক্ষার বিস্তার শুরু হয়। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল বীটন সাহেব (বেথুন)-এর উদ্যোগে তৈরি হওয়া বেথুন স্কুল।

বীটন (বেথুন) স্কুল প্রতিষ্ঠা

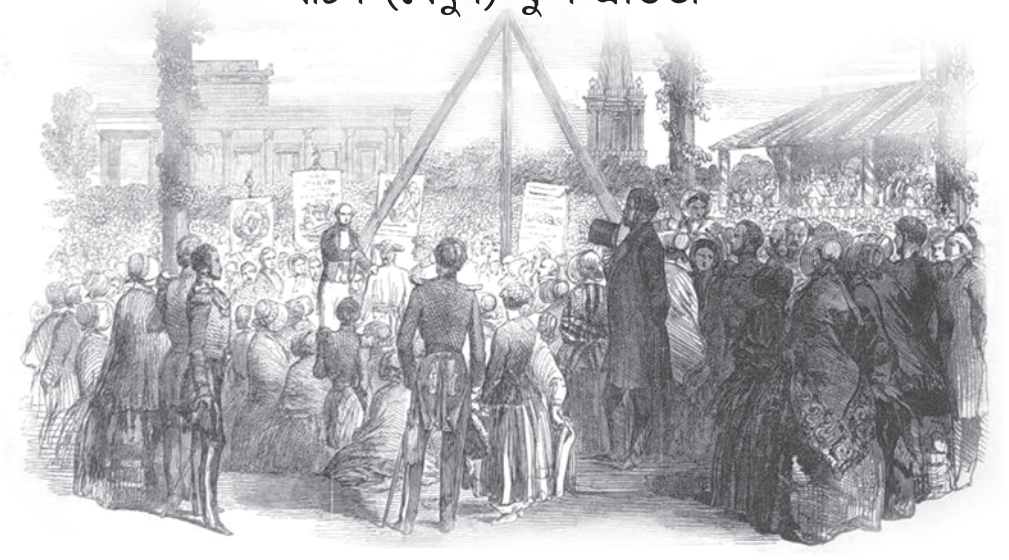

জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ণয়

ভারতে ঔপনিবেশিক প্রশাসন রাজস্ব ব্যবস্থা বিষয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল। তার মধ্যে জমি জরিপ করা ও তার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ণয় করার প্রক্রিয়াটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার নতুন নবাব মির জাফরের থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা থেকে কুলপি পর্যন্ত ২৪টি পরগনার জমিদারি পায়। তখন রবার্ট ক্লাইভ নতুন জমিদারি মাপজোকের জন্য একদল জরিপবিদের খোঁজ করতে থাকেন। অবশেষে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড নতুন ২৪ পরগনার জমি জরিপের কাজ শুরু করেন। তবে কাজ শেষ হওয়ার আগেই ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড মারা যান। তাঁর কাজ শেষ করেন হগ্ ক্যামেরন।

জেমস রেনেল-এর হিন্দুস্তান-এর মানচিত্র-সংকলনের আখ্যাপত্র। ছবিটিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁদের পুঁথিপত্র তুলে দিচ্ছেন ব্রিটানিয়া-র হাতে। ব্রিটানিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ক্ষমতার প্রতীক। অর্থাৎ ছবিটি যেন বলতে চাইছে যে, ব্রিটানিয়াই ক্রমে হয়ে উঠবেন ভারতের অতীত-সংস্কৃতির রক্ষক।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নদীপথগুলি জরিপ করেন জেমস রেনেল। তাঁকেই ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল বা জরিপ বিভাগের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করে। বাংলার নদীপথগুলি জরিপ করে রেনেল মোট ১৬টি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন।

সেই প্রথম সেই আমলের বাংলার নদী-গতিপথের মানচিত্র বানানো হলো।

বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪ খ্রি:) পর ও দেওয়ানির অধিকার পাওয়ার ফলে ক্রমেই বাংলার জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ণয় বিষয় কোম্পানি তৎপর হয়ে ওঠে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কম্পট্রোলিং কাউন্সিল অভ রেভেনিউ নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া আরো একটা আলাদা রেভেনিউ বোর্ড তৈরি করা হলো। তার নাম কমিটি অভ রেভেনিউ। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কমিটি অভ রেভেনিউকে নতুন করে সাজিয়ে তার নাম দেওয়া হয় বোর্ড অভ রেভেনিউ। সেই থেকে ঐ নতুন বোর্ড অফ

রেভেনিউই রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় দেখাশোনা করতে থাকে।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলের জলাশয়, রাস্তা ও জনবসতির একটি মানচিত্র বানাও।

টুকরো কথা

ইজারাদারি ব্যবস্থা

ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলা প্রেসিডেন্সির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত নিয়ে নানা পরীক্ষা করতে শুরু করে। প্রথমে জমির নিলামে সবচেয়ে বেশি ডাক দেওয়া ব্যক্তিকে জমি দেওয়া হতো। পরে প্রতি এক বছর করে একজন ব্যক্তির সঙ্গে কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত করে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস নদিয়া জেলায় একটি নতুন ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত চালু করেন। সেই বন্দোবস্ত

অনুযায়ী যে ব্যক্তি জমির নিলামে সবথেকে বেশি খাজনা দেওয়ার ডাক দেবে তার সঙ্গে কোম্পানি ঐ জমির বন্দোবস্ত করবে। পাঁচ বছরের জন্য ঐ জমি ঐ ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হতো বলে ঐ বন্দোবস্তকে ইজারাদারি বন্দোবস্ত বলা হতো। তার পাশাপাশি ইজারার মেয়াদ পাঁচ বছরের জন্য ছিল বলে তাকে পাঁচসালা বন্দোবস্ত বলা হতো। তবে দ্রুতই ইজারাদারি বন্দোবস্তের বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অনেক ইজারাদারই গ্রাম সমাজের বাইরের লোক হওয়ার জন্য ঠিকমতো রাজস্ব নির্ণয় করতে পারেননি। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ধার্য রাজস্ব বাস্তব রাজস্ব আদায়ের থেকে বেশি হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য দেখা যায় ইজারাদারদের অনেকেই দেয় রাজস্ব শোধ করতে ব্যর্থ হয়। তাই ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি

দশসালা বন্দোবস্ত চালু করে। কিন্তু ক্রমে এসব বন্দোবস্ত তুলে দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় চালু করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। তার ফলে বাংলার ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তের একটা নতুন পর্যায় শুরু হয়। পাশাপাশি, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও জরিপ ও ভূমি-রাজস্ব নির্ণয় বিষয়ক কার্যকলাপ চলেছিল।

জেমস রেনেল-এর বাংলা, বিহার, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও আগ্রা-দিল্লির মানচিত্র-সংকলনের আখ্যাপত্র।

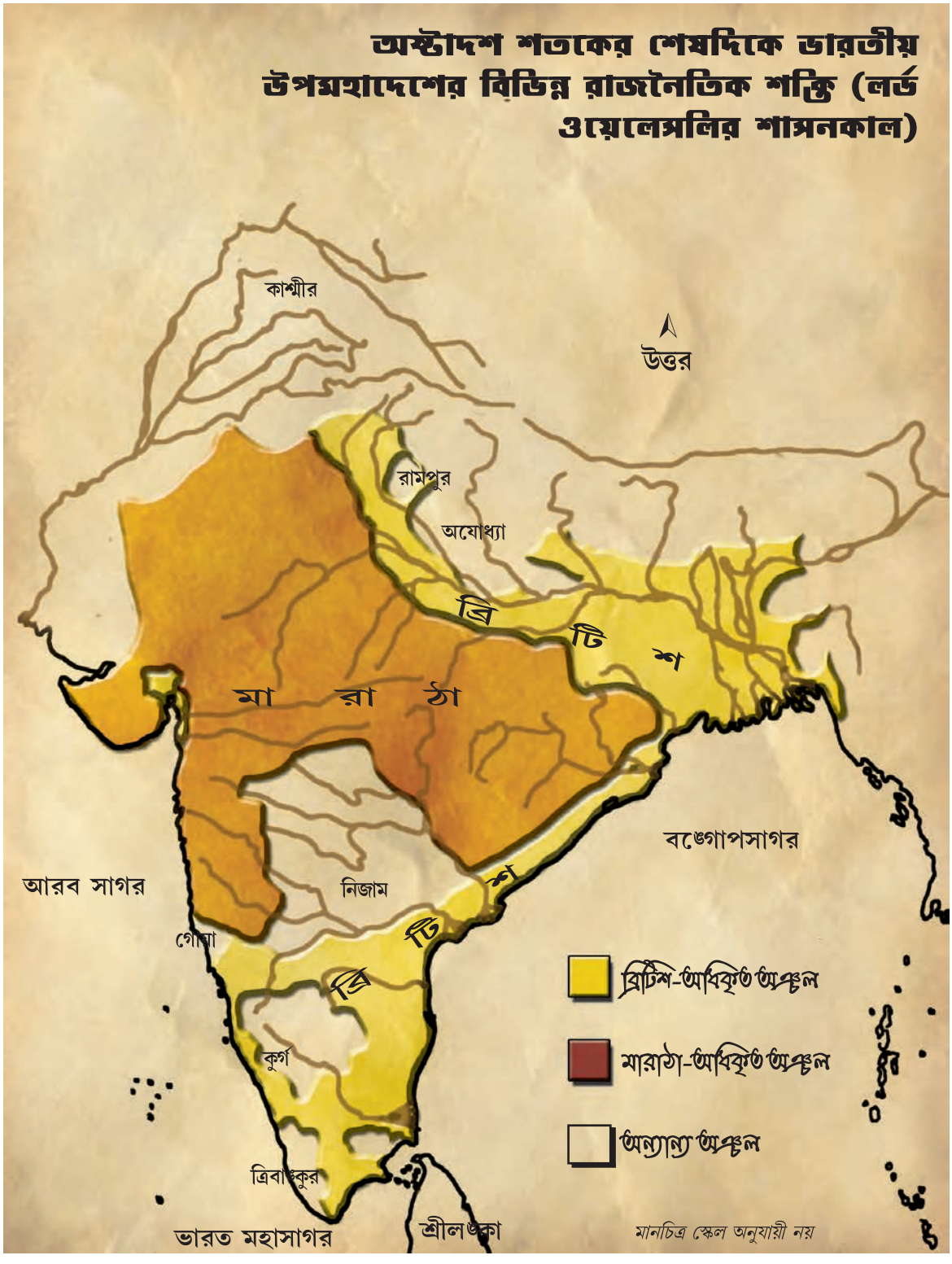
অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি (লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকাল)
কাশ্মীর
উত্তর
রামপুর
অযোধ্যা
ব্রিটিশ
মারাঠা
আরব সাগর
নিজাম
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
কুর্গ
ত্রিবাঙ্কুর
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল
মারাঠা-অধিকৃত অঞ্চল
অন্যান্য অঞ্চল
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

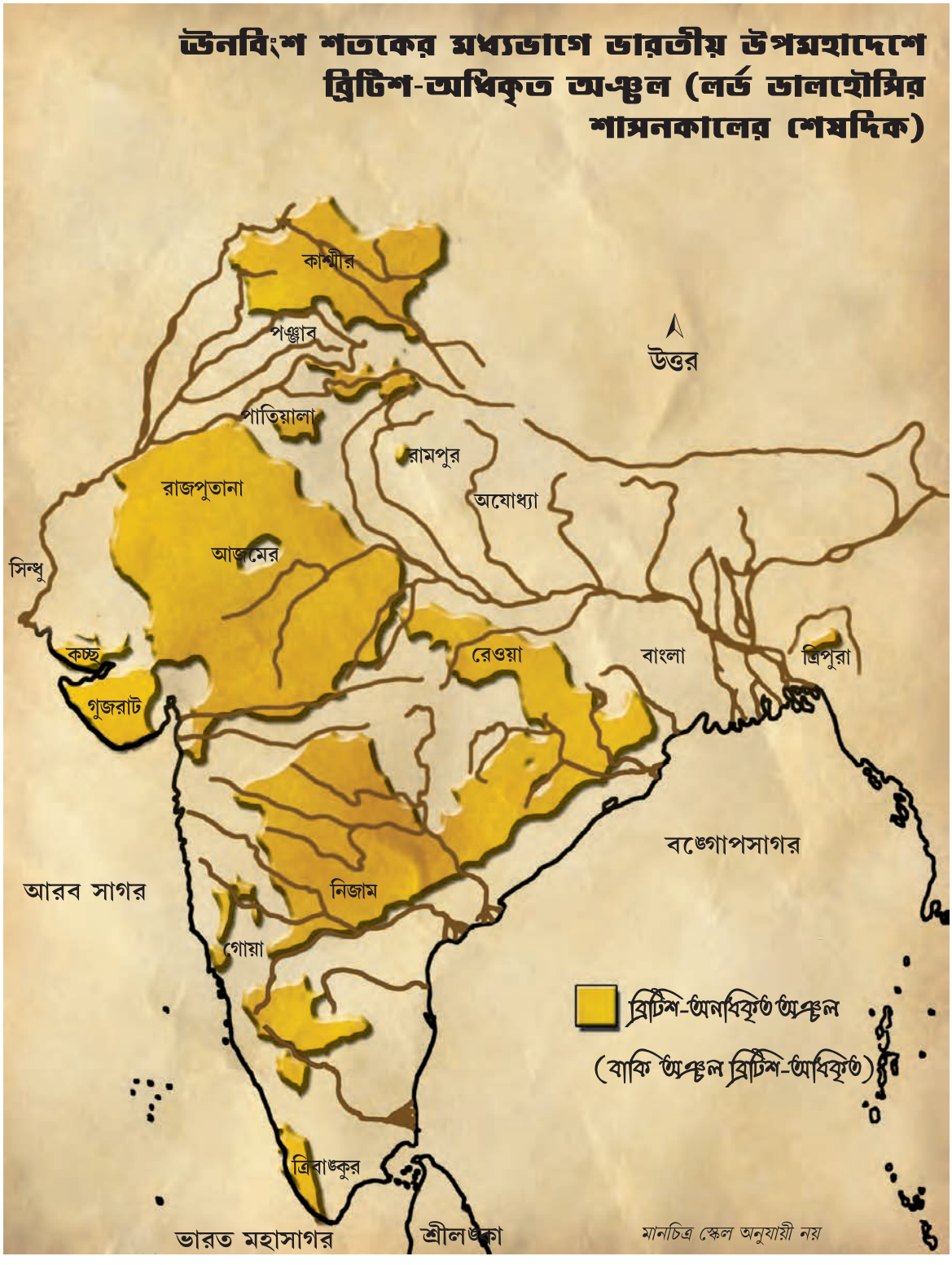
ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল (লর্ড ডালহৌসির শাসনকালের শেষদিক)
কাশ্মীর
পঞ্জাব
উত্তর
পাতিয়ালা
রামপুর
রাজপুতানা
অযোধ্যা
আজমের
সিন্ধু
কচ্ছ
রেওয়া
বাংলা
ত্রিপুরা
গুজরাট
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
নিজাম
গোয়া
ব্রিটিশ-অনধিকৃত অঞ্চল
(বাকি অঞ্চল ব্রিটিশ-অধিকৃত)
ত্রিবাঙ্কুর
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বার করো :

ক) বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, বাংলা

খ) ক্লাইভ, হেস্টিংস, দুপ্লে, কর্নওয়ালিস

গ) বাংলা, বিহার, সিন্ধু প্রদেশ, উড়িষ্যা

ঘ) ডেভিড হেয়ার, উইলিয়ম কেরি, জোনাথন ডানকান, উইলিয়ম পিট

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) বাংলা প্রেসিডেন্সিকে সেন্ট জর্জ দুর্গ প্রেসিডেন্সি বলা হতো।

খ) বেনারসে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জোনাথন ডানকান।

গ) উইলিয়ম কেরি ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি সোসাইটির সদস্য।

ঘ) দশ বছরের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার জন্য কোম্পানি ইজারাদারি ব্যবস্থা চালু করেছিল।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৪০টি শব্দ) :

ক) ব্রিটিশ প্রেসিডেন্সি ব্যবস্থা কাকে বলে?

খ) কোম্পানি-পরিচালিত আইন ব্যবস্থাকে সংহত করার ক্ষেত্রে লর্ড কর্নওয়ালিস কী ভূমিকা নিয়েছিলেন?

গ) কোম্পানির সিপাহিবাহিনী বলতে কী বোঝো?

ঘ) কোম্পানি-শাসনে জরিপের ক্ষেত্রে জেমস রেনেল-এর কী ভূমিকা ছিল?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের তুলনামূলক আলোচনা করো। ঐ সংস্কারগুলির প্রভাব ভারতীয়দের উপর কীভাবে পড়েছিল?

খ) ভারতে কোম্পানি-শাসনের বিস্তার ও সেনা বাহিনীর বৃদ্ধির মধ্যে কী সরাসরি সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

গ) ব্রিটিশ কোম্পানির প্রশাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা কী ছিল? কীভাবে আমলারা একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো।

ঘ) কোম্পানি-শাসনের শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে বোম্বাইয়ের কোনো তফাৎ ছিল কী? কোম্পানির শিক্ষানীতির প্রভাব ভারতীয় সমাজে কীভাবে পড়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

ঙ) কোম্পানি-শাসনের সঙ্গে জমি জরিপের সম্পর্ক কী ছিল? ইজারাদারি বন্দোবস্ত চালু করা ও তা তুলে দেওয়ার পিছনে কী কী কারণ ছিল?

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০ টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরো তুমি কোম্পানির একজন সিপাহি। তোমার কাজ ও কাজের পরিবেশ বিষয়ে জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

খ) ধরো তুমি ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার বাসিন্দা। হিন্দু কলেজ ও বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় কলকাতার দু-জন শিক্ষিত ভারতীয়র মধ্যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটি কথোপকথন লেখো।

৪ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র

১৭৬৯-'৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল। তার ফলে কোম্পানি নিজের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে নতুন করে ভারতে শুরু করে। বাংলায় কোম্পানির নতুন শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইজারাদারি ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু তার ফলেও অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। বেশিবেশি রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে কৃষকদের ঘাড়ে খাজনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে কৃষক সমাজে চূড়ান্ত সংকট দেখা দেয়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনকে নতুন করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

খাজনা আদায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর গলদগুলো লর্ড কর্নওয়ালিস দ্রুতই বুঝতে পেরেছিলেন। রাজস্ব আদায়ের মূল পদ্ধতির ফলে কৃষক সমাজ

শস্য ঝাড়াইয়ে রত কৃষক। মূল ছবিটি সোমনাথ হোড়-এর আঁকা।

ও দেশীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার ফলে কোম্পানিও যথেষ্ট লাভ করতে পারছিল না। কৃষির সংকটের ফলে কোম্পানির রেশম ও কার্পাস রফতানিতেও ভাটা পড়েছিল। দেশীয় হস্তশিল্প উদ্যোগের উপরেও কৃষি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। এই সমস্ত সমস্যার মূলে ছিল রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত বন্দোবস্ত। তাই কোম্পানির অনেক আধিকারিক খাজনা আদায় ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার কথা বলেছিলেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়। মনে করা হয়েছিল যে, এর ফলে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসেবে গরমিল হবে না। জমিদারিগুলি থেকে কোম্পানির কত রাজস্ব প্রাপ্য তার হিসাব নিশ্চিত হয়ে

গিয়েছিল। ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের ইচ্ছেমতো খাজনা আদায় করতে পারত না। কোম্পানি আশা করেছিল জমিদারেরা নিজেদের লাভের হার বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যই জমিতে বেশি অর্থ বিনিয়োগ করবে। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির রাজস্ব উঁচু হারে হিসেব করা হয়েছিল।

রাজস্ব আদায় করা হবে কার কাছ থেকে, তা নিয়ে নীতি নির্ধারণ করতে গিয়েও কোম্পানি সমস্যায় পড়েছিল। নবাবি আমলের জমিদারদের থেকে রাজস্ব আদায় করতেন নবাব। জমিদাররা চাষিদের থেকে খাজনা আদায় করত। সেই পদ্ধতিটি কোম্পানি-শাসনে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো জমিদারকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় কাউকে আবার রেখে